দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 14 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... পৃষ্ঠা ...

পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানের নয় ❑ নয়া বিতর্ক সৃষ্টির আশংকা

তড়িঘড়ি করে গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধন হচ্ছে

সালাহউদ্দিন বাবলু ॥ অবশেষে একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে আসন্ন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে এবং কোন বিশেষজ্ঞ সুপারিশ ছাড়াই বহুল আলোচিত গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রেডিং পয়েন্টের ৭টি ধাপ নির্ধারণ করে এবং সংশ্লিষ্ট আরো কিছু নতুন সিদ্ধান্তসহ আজকালের মধ্যেই সংশোধিত গ্রেডিং সম্পর্কে একটি নতুন সার্কুলার জারি করতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে এ জন্য শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণ নিজস্ব পছন্দে এবং আমলাতান্ত্রিক উপায়ে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েই শিক্ষাবোর্ডগুলোর অধীনস্থ ২টি পাবলিক পরীক্ষার জন্য যে সংশোধিত নতুন গ্রেডিং পদ্ধতি চূড়ান্ত করেছে তা নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টির সমূহ আশংকা রয়েছে। ফলে সংশোধিত গ্রেডিং পদ্ধতিকেও আবার সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। পাবলিক পরীক্ষার মূল্যায়নে 'গ্রেডিং পদ্ধতি' বর্তমানে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও বাংলাদেশে গত দু'বছর ধরে প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতি এবং সংশোধিত নতুন গ্রেডিং পদ্ধতির কোনটিই আন্তর্জাতিক মানের নয়। আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কোন

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

তড়িঘড়ি করে গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধন করা হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রেডিং পদ্ধতির সাথেই এর তুলনা করা বা মিল ঘটানো কিংবা ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। গ্রেডিং সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয় মতামত গ্রহণ ছাড়াই ২০০১ সালের এসএসসি পরীক্ষার মাত্র ২/৩ দিন আগে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর ব্যক্তিগত আগ্রহে যেমনি তড়িঘড়ি করে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল, ঠিক একইভাবে বর্তমানেও প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা ও মতামত গ্রহণ ছাড়াই কয়েকটি বিশেষ পত্রিকার বিভ্রান্তিকর রিপোর্টিংয়ের প্রেক্ষিতে নানা সমালোচনার মুখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবারো পরীক্ষার সামনে এসে তড়িঘড়ি করে গ্রেডিং পদ্ধতির সংশোধন করছে। সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধনের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোন মতামতই গ্রহণ করেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অথচ এসএসসি ও এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর ফলে দেশের উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রেও অর্থাৎ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নেও গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সকল রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আগামী দু'বছরের মধ্যে তাদের সকল কোর্সের জন্য গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্তও নিয়েছে। এদিকে বর্তমানে বাংলাদেশ

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু রয়েছে। এ অবস্থায় সরকারী-বেসরকারী সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কোন সমন্বয় না করে এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে কোন আলোচনা বা মতামত গ্রহণ ছাড়াই শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকজন আমলার নিজস্ব পছন্দে যেভাবে শিক্ষা বোর্ডগুলোর গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধন করছে তাতে এই সংশোধিত গ্রেডিং পদ্ধতি আবার সংশোধন করতে হবে। নতুবা একই দেশে একাধিক ধরনের উদ্ভট গ্রেডিং পদ্ধতি চালু থাকায় এ দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা আন্তর্জাতিকভাবে অবমূল্যায়িত হবে। এখনই শিক্ষা বোর্ড তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গ্রেডিংয়ের সাথে বুয়েটের গ্রেডিংয়ের আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। অবশ্য বুয়েটের গ্রেডিং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং প্রায় একই ধরনের গ্রেডিং গাজীপুরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ইসলামী কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের অন্যান্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রচলিত গ্রেডিং

২০০১ সালের এসএসসি পরীক্ষা থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রবর্তিত যে গ্রেডিং পদ্ধতি বর্তমানে চালু রয়েছে তাতে ধাপ আছে ৫টি। ৮০ থেকে ১০০ নম্বরের জন্য 'এ প্লাস' গ্রেড (পয়েন্ট ৫), ৬০ থেকে ৭৯ 'এ' গ্রেড (পয়েন্ট ৪), ৫১ থেকে ৫৯ 'বি' গ্রেড (পয়েন্ট ৩), ৪১ থেকে ৫০ 'সি' গ্রেড (পয়েন্ট ২) এবং ৩৩ থেকে ৪০ 'ডি' গ্রেড পেলে তাকে ফেল বা 'এফ' গ্রেড (পয়েন্ট ০) হিসেবে ধরা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টকে যোগ করে ৮ দিয়ে ভাগ করে জিপিএ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) বের করা হয় এবং এটিই হচ্ছে কোন পরীক্ষার্থীর ফলাফল। এসএসসিতে মোট নম্বর ১০০০ ও ১০টি পত্র থাকলেও বাংলা ও ইংরেজীর দু'টি পত্রকে এক করে প্রতিটি বিষয়ে শতকরা একশ' নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত গ্রেড থেকে জিপিএ বের করার জন্য মোট ৮টি বিষয় ধরে প্রাপ্ত সর্বমোট গ্রেড পয়েন্টকে ৮ দিয়ে ভাগ করা হয়। বর্তমানে প্রচলিত গ্রেডিংয়ে চতুর্থ বিষয়ে প্রাপ্ত কোন গ্রেড বা গ্রেড পয়েন্টকে হিসাবে ধরা হয় না এবং ৪ বিষয় পর্যন্ত ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী বছরে ঐ ফেল করা বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে ফলাফল অক্ষুণ্ন রাখার সুযোগ দেয়া হয়। সেই সাথে এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যূনতম জিপিএ ১.৫ হলে তাকে পরবর্তী পরীক্ষায় ঐ বিষয়ে পাস করার শর্তে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। ২০০৩ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষাতেও এই গ্রেডিং কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গ্রেডিং নিয়ে যে অসন্তোষ

এই গ্রেডিং নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের যেসব অসন্তোষ ছিল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ৪র্থ বিষয়ে ফলাফল অন্তর্ভুক্ত না করা এবং ৫০-এর নীচের নম্বর বিন্যাসের সাথে ৫০-এর ওপরের নম্বর বিন্যাস একরকম না হওয়া। বিশেষ করে ৬০ থেকে ৭৯ নম্বরের দীর্ঘ ব্যাপ্তিটির ('এ' গ্রেড) ব্যাপারে সবারই কমবেশী আপত্তি ছিল। তাছাড়া পাস নম্বর (৩৩) নিয়েও বিতর্ক ছিল। অপরদিকে এই গ্রেডিংকে আন্তর্জাতিক পদ্ধতির গ্রেডিংয়ের সাথেও কোনভাবে মেলানো যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় পাস নম্বর ন্যূনতম ৪০ করে এবং ৪র্থ বিষয় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ৬০ থেকে ৭৯ নম্বরের গ্রেড বিন্যাসটিকে ভেঙ্গে ২টি করার ও ৮০ থেকে ১০০ নম্বরের বিন্যাসটি অক্ষুণ্ন রাখার দাবী ওঠে।

২০০১ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের পর এ দাবী প্রবল হলে তৎকালীন গ্রেডিং প্রণেতারা ঢাকা বোর্ডে সংবাদ সম্মেলন করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দেন।

গ্রেডিং সংশোধনের প্রক্রিয়া

২০০১ সালের পর সরকার পরিবর্তন হয়ে গেলে গ্রেডিং সংশোধনের প্রক্রিয়া চাপা পড়ে যায় এবং নতুন সরকারও দীর্ঘ ১ বছর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকে। অবশেষে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ও ১৮ নভেম্বর শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে বিয়ামে গ্রেডিং সংস্কারের বিষয়ে দু'টি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যান, শিক্ষা বিভাগের কিছু পদস্থ কর্মকর্তা ও ঢাকা মহানগরীর কিছু স্কুল-কলেজের প্রধানদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ঐ সভার প্রথমটিতে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত থাকলেও পরে আর তাদের ডাকা হয়নি। দু'টি সভাতেই গ্রেডিং সংস্কার নিয়ে নানা জন নানা মত দিলেও এ ব্যাপারে কোন ঐকমত্যে আসা

গ্রেডিং নিয়ে যে বিভ্রান্তি

বাংলাদেশে প্রচলিত বর্তমান গ্রেডিং বা সংশোধিত আকারে যে গ্রেডিং আসছে তার কোনটিই আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। এজন্য এই গ্রেডিংকে বিদেশে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ আন্তর্জাতিক নিয়মে ২-এর নীচে ও ৪-এর ওপরে কোন গ্রেড পয়েন্ট নেই এবং তিনটির বেশী গ্রেডও নেই। প্রতি ২০ নম্বরে একেকটি গ্রেড ধরা হয় এবং ২০ নম্বরের জন্য ১ পয়েন্ট করে ধার্য রয়েছে। তবে ২০ নম্বরের ব্যাপ্তিতে প্রতিটি গ্রেডের আবার ৩টি স্তর রয়েছে। যেমন 'এ প্লাস', 'এ' (রেগুলার) ও 'এ মাইনাস'। সর্বনিম্ন পাস নম্বর ৪০। ৮০ নম্বরের ওপরও কোন গ্রেড নেই। আন্তর্জাতিক পদ্ধতির গ্রেডিংয়ে কোন শিক্ষার্থীর গ্রেড বা গ্রেড পয়েন্ট দেখেই বলে দেয়া যায় সে ঐ বিষয়ে শতকরা কত নম্বর পেয়েছে। বাংলাদেশের বুয়েটে ও অন্যান্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রেডিং পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এই পদ্ধতিতে শতকরা ৮০ বা তার ওপরে প্রাপ্ত নম্বরের জন্য 'এ প্লাস' (পয়েন্ট ৪), ৭৫% থেকে ৮০%-এর নীচে 'এ' রেগুলার (পয়েন্ট ৩.৭৫), ৭০% থেকে ৭৫%-এর নীচে 'এ মাইনাস' (পয়েন্ট ৩.৫০), ৬৫% থেকে ৭০% এর নীচে 'বি প্লাস' (পয়েন্ট ৩.২৫), ৬০% থেকে ৬৫%-এর নীচে 'বি' রেগুলার (পয়েন্ট ৩.০০), ৫৫% থেকে ৬০%-এর নীচে 'বি মাইনাস' (পয়েন্ট ২.৭৫), ৫০% থেকে ৫৫%-এর নীচে 'সি প্লাস' (পয়েন্ট ২.৫০), ৪৫% থেকে ৫০%-এর নীচে 'সি' রেগুলার (পয়েন্ট ২.২৫), ৪০% থেকে ৪৫%-এর নীচে 'সি মাইনাস' (পয়েন্ট ২.০০) এবং ৪০%-এর নিচে ফেল বা এফ গ্রেড (০)।

এই নিয়মে শতকরা ১০০ ভাগ নম্বরকে ৫ পয়েন্ট ও শতকরা ২০ ভাগ নম্বরকে ১ পয়েন্ট ধরে দুটোই উহ্য রাখা হয় এবং ৮০-এর ওপরে প্রাপ্ত নম্বরকে ৪ পয়েন্ট দেয়া হলেও একে ৫ পয়েন্টের সমানই বিবেচনা করা হয়। যদিও তা ঘোষিত নয়। এই নিয়মে কোন ছাত্র-ছাত্রীর প্রাপ্ত গ্রেড বা গ্রেড পয়েন্ট কিংবা জিপিএ অনুযায়ী সহজেই প্রাপ্ত শতকরা নম্বরও বের করা যায়। আর পৃথিবীর কোথাও এখন ৪০-এর নীচে পাস নম্বর নেই। বাংলাদেশের প্রকৌশল ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরী বোর্ড, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন ও ইংলিশ মাধ্যমের স্কুলগুলোতেও সর্বনিম্ন পাস নম্বর ৪০। এজন্য গ্রেডিং পদ্ধতির বিন্যাস ৪০ নম্বর থেকেই শুরু করা হয় এবং গ্রেডিংয়ের মূল ধাপও ৩ থেকে ৪টির বেশী রাখা হয় না।